Vol. 43 | No. 3 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অসীম রায়ের উপন্যাস

Volume	43
Issue	3
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সুব্রত কুমার দাস
Published online	June 1, 2000
DOI	10.62328/sp.v43i3.410
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i3.410
Pages	57-68
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অসীম রায়ের উপন্যাস

সুব্রত কুমার দাস*

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম উপন্যাস প্রকাশের পর থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস প্রকাশ পর্যন্ত অসীম রায় (১৯২৭-১৯৮৬) একজন নিয়মিত লেখক। ১৯৬৭ পর্যন্ত শুধুই উপন্যাস লিখেছেন, যদিও তা সংখ্যায় বেশ কম এবং তারপর থেকে একনাগাড়ে গল্প ও উপন্যাস তাঁর কলমে সৃষ্টি হয়েছে। অসীম রায় রচিত উপন্যাসের মোট সংখ্যা নিয়ে সংশয় থাকলেও সেটি কমবেশি ষোল, যার মধ্যে আবার পাঁচটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। মোট গল্প চৌষট্টিটি। ডায়েরি ও আত্মজীবনীমূলক দীর্ঘ রচনা *অসীম রায়ের ডায়েরী, জার্নাল ও ধুলো ধোঁয়া নক্ষত্র* ছাড়াও ১৯৮৬তে প্রবন্ধগ্রন্থ *রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরাধিকার* প্রকাশিত হয়। বাকি আর যে একটি পরিচয় রয়েছে অসীম রায়ের তা হলো তাঁর কাব্যকৃতি। সাহিত্যিক জীবন শুরুই হয়েছিল কবিতা দিয়ে। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থও কাব্য *ফুটপাথে ফুলের গল্প*[১] (১৯৫০)। ১৯৭১-এ আর একটি কবিতার বই *আমি হাঁটছি* প্রকাশিত হয়। এতসব লেখালেখির পরও বাংলা উপন্যাসে অসীম রায়ের স্থান কোথায় তা নির্ধারণ বেশ কষ্টসাধ্য। তিনি সিরিয়াস লেখক হিসেবে জীবদ্দশাতেই পরিচিতি পেয়েছিলেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবাদপ্রতিম গ্রন্থ *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারার* 'সৃজ্যমান উপন্যাস-সাহিত্য' অংশে তাঁর তৃতীয় উপন্যাসটি নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[২] বাংলা উপন্যাস আলোচনায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*-এ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় বারবারই অসীম রায়ের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।[৩] শাহীদা আখতারের *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*,[৪] বীরেন্দ্র দত্তের *বাংলা কথাসাহিত্যের একাল*[৫] এবং সত্য গুহের *একালে গদ্য পদ্য আন্দোলনের দলিল*[৬] অসীম রায়ের উপন্যাস প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ সকল প্রসঙ্গের অবতারণা এ কারণে যে ভারত-বিভাগোত্তর বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক হিসেবে অসীম রায়ের নাম বারবার উচ্চারিত হলেও যেমন মৃত্যুর আগেও তাঁর গ্রন্থ বিশেষ বিকোয়নি[৭], মৃত্যুর পরেও পাঠকপ্রিয়তার (জনপ্রিয়তা তো দূরঅস্ত) প্রশ্নেও তাঁর সাফল্য ঘটেনি।[৮] অসীম রায়কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা প্রধানত তাঁর *একালের কথা, গোপালদেব, দ্বিতীয় জন্ম, আবহমানকাল ও নবাববাঁদী* উপন্যাসে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় অসীম রায়ের প্রথম উপন্যাস *একালের কথা।* ভারতের স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে ১৯৪৬ সালে কোলকাতায় সংঘটিত হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। সেই সঙ্গে এতে রয়েছে সে-সময়কালের সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় যেটি তাঁর পরবর্তী উপন্যাস *গোপালদেব* (১৯৫৫) এবং দ্বিতীয় জন্ম (১৯৫৭)তেও বর্তমান। এর পর

---

* প্রভাষক, বাংলাদেশ রাইফেলস্ কলেজ, ঢাকা।

একে একে অসীম রায় রচনা করেন *রক্তের হাওয়া* (১৯৫৯), *দেশদ্রোহী* (১৯৬৬), *শব্দের খাঁচায়* (১৯৬৮), *অসংলগ্ন কাব্য* (১৯৭৩), *একদা ট্রেনে* (১৯৭৬) এবং *আবহমানকাল* (১৯৭৮)। ইতোমধ্যে *গল্পকবিতায়*[৯] নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিকায় উপন্যাস *গৃহযুদ্ধ* এবং ১৯৭৫-এ *কৃত্তিবাস*-এর শারদীয় সংখ্যায় *অর্জুন সেনের জিজ্ঞাসা* প্রকাশিত হয়। সমকালীন সময় এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে *আবহমানকাল*-এর মহাকাব্যিক রচনা শেষে অসীম রায় দৃষ্টি ফেরান ইতিহাসের কালগর্ভে। ১৯৭৯ ও ১৯৮০তে তাঁর তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। সেগুলো গ্রন্থরূপ পায়নি। সে তিনটি উপন্যাস হলো *পলাশী কতদূর* (শারদীয় *পরিবর্তন*), *নবাব ক্লাইভ* (শারদীয় *পরিচয়*) ও *নবাব আলিবর্দী* (শারদীয় *বসুমতী*)। *বারোমাস* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাস *নবাববাঁদী*[১০] ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থরূপ লাভ করে। ১৯৮২তে প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস হলো *কচ ও দেবযানী*।

অসীম রায়ের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণের আগে তাঁর ব্যক্তিজীবনের উপর আলোকপাত আমাদের আলোচনাকে খানিকটা সহজতা দান করবে। ১৯২৭ সালের ৯ মার্চ[১১] অসীম রায় জন্মগ্রহণ করেন ভোলায়। বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ায় কর্মসূত্রে বাংলার বিভিন্ন স্থানে তাঁদের অবস্থান করতে হয়েছিল। ম্যাট্রিক পাসের পর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯৪৬ সালে সেখান থেকেই ইংরেজিতে অনার্সসহ স্নাতক হন। ১৯৪৮-এ এম এ পাস করেন ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৫০ সালে চাকরি নেন *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে। এর পরে বিভিন্ন কারণে বেকারও থেকেছেন কিছুদিন। মোট পঁয়ত্রিশ বছরের সাংবাদিকজীবন তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত। ছাত্রাবস্থা থেকেই অসীম রায় ছিলেন বাম রাজনীতির সংস্পর্শে। রাজনৈতিক নীতিবোধে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এলেও তিনি একেবারে সরে যাননি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিশ্ববীক্ষা থেকে। তাঁর সাহিত্যকর্মে বৈপ্লবিক এ চেতনাটি উপস্থিত। ব্যক্তিজীবনে অসীম রায় ছিলেন ভীষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ, স্পর্শকাতর, বন্ধুবৎসল। সে কারণেই জীবনে অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথেই হয়েছিল মতের অমিল। কখনও সে অমিল দ্বন্দ্বেও রূপ নিয়েছে বৈকি। তাঁর ব্যক্তিজীবনের এ সকল প্রেম অ-প্রেম সমস্ত কিছুই তাঁর সাহিত্যে বর্তমান--কখনও কখনও সরাসরিভাবেই। ব্যক্তি অসীম রায় এবং ব্যক্তি অসীম রায়ের সাথে তাঁর সাহিত্যিক মনের সংযোগ সাধন ইত্যাদি নিয়ে স্পষ্ট ধারণার জন্য তাঁর দীর্ঘ জার্নাল (ডায়েরি) পাঠককে অনেক সাহায্য করে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অব্যবহিত আগ থেকে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের উনত্রিশে জুলাই থেকে মোটামুটি তিন বছর পর্যন্ত *একালের কথা* উপন্যাসের সময়কাল। প্রধান চরিত্র নিত্যগোপালের ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গকে ধারণ করে উপন্যাসটি রচিত হলেও এর প্রধান উপজীব্য স্বাধীনতা-পূর্বকালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রক্তক্ষয়ী সে দাঙ্গার মর্মস্পর্শী রূপ কেমন করে একটি সমাজকে, একটি পরিবারকে, এবং সর্বোপরি একটি ব্যক্তি-মানসকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে *একালের কথা* তারই অসামান্য রূপায়ণ। 'পরাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করতে যাচ্ছে দু'টি স্বাধীন দেশ ভারত ও পাকিস্তানরূপে, যে বিভাগের মূলে নিহিত সাম্প্রদায়িকতা'—এই সিদ্ধান্তটি প্রকৃতপক্ষে জনগণের কী কাজে এসেছিল এবং সে সময়ের প্রেক্ষাপটে, অবিমৃশ্যকারী, তাৎক্ষণিক এ সিদ্ধান্তটি (সর্বপ্রথম গুজব হিসেবে ছড়িয়েছিল) কী ভীষণ অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয় একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে, নিত্যগোপাল ও তার মুসলমান বন্ধু হাশেমের গল্প প্রসঙ্গে *একালের কথাতে* তার বর্ণনা রয়েছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা *একালের কথার* মূল বিষয়বস্তু হলেও তা উপন্যাসটির এক-চতুর্থাংশের কম অংশ দখল করেছে। উপন্যাসের দীর্ঘ বাকি অংশ ভাল লাগলেও প্লট-কাঠামোর প্রশ্নে তা কম প্রাসঙ্গিক। অনেক ক্ষেত্রেই গল্পকে দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছায় ভারী। 'দুই বন্ধু', 'শ্বেত করবী', 'আবার গোড়া থেকে', 'আমি তো কিছু চাইনি', 'দুইভাই' ও সর্বশেষ অধ্যায় দুই পৃষ্ঠার 'কথাশেষ' -এর মধ্যে প্রথমটি দীর্ঘতম মোট তেষট্টি পৃষ্ঠা। 'কথাশেষ' -এর বিবরণগত বৈচিত্র্যও আছে। উপন্যাসের শুধু এ অংশটুকুই উত্তম পুরুষে লেখা। যে উত্তম পুরুষটি লেখক নিজেই বাকি সবটুকুতেই বক্তা সর্বদ্রষ্টা তৃতীয় পুরুষ।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছাড়াও এ উপন্যাসের আর একটি প্রতিপাদ্য বাম রাজনীতি; তবে সেটি কোনক্রমেই এ রাজনীতির পক্ষ বা বিপক্ষতা নিয়ে নয়। যদিও শাহীদা আখতার বলেন,

> অসীম রায় তীক্ষ্ণ সমাজসচেতন লেখক। সাম্যবাদী চিন্তা মানুষের সামাজিক ও আত্মিক অস্তিত্বকে কতখানি প্রভাবিত করেছে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন উপন্যাসে। আমাদের পরিচিত কালের সামগ্রিক রূপকে আবিষ্কার করতে হলে ব্যক্তি ও সমাজের অন্তর্গত বিশ্লেষণ, ব্যক্তির আত্মান্বেষণ ও তার সমাজ-জিজ্ঞাসার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা প্রয়োজন।[১২]

১৯৪৭-এর বিভাগোত্তর কালে যুবক শ্রেণীর মধ্যে প্রগতিশীল রাজনীতি নিয়ে যে জোয়ার এসেছিল সে-প্রেক্ষাপটে এ-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা দাঁড়িয়ে। বাম রাজনীতির আশা আকাঙ্ক্ষা সবই এখানে মূর্ত হয়েছে। তবে প্লট-সংক্রান্ত আলোচনায় এ প্রশ্ন হয়তো তোলাই যায়, নিত্য ক্যানিঙে অনিল মাস্টারের স্কুলে চাকরি নিয়েছিল কেন? —ওকে কি পার্টি থেকেই পাঠানো হয়েছিল? দু'বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয় অসীম রায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস *গোপালদেব*। অনেকেই *গোপালদেব*কে অসীম রায়ের আত্মজৈবনিক ট্রিলজির দ্বিতীয় খণ্ড (যার প্রথমটি *একালের কথা* এবং তৃতীয়টি *একদা ট্রেনে*) বলে অভিহিত করেন। তিনটি উপন্যাসেই নিত্যগোপাল চৌধুরী (যিনি নিজেই *গোপালদেব*-এর ২য় পৃষ্ঠাতেই গোপালদেব নাম ধারণ করেন) উপস্থিত। কালানুক্রমিকতার দিক থেকেও খানিক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে উপরোক্ত বক্তব্যটি। *গোপালদেব* সম্পর্কে অসীম রায় কথা প্রসঙ্গে তাঁর জার্নালে লিখেছেন, 'গোপালদেব' লিখে বিয়ের আগে প্রায় একঘরে হয়েছিলাম'।[১৩] গোপালের বন্ধু অন্তুর মা নয়ন। সে-নয়নের জন্যই গোপালের ভাবনা, ভালবাসা, আকাঙ্ক্ষা যার সব কিছু বড় বিশ্বাস্য ও সজীব বলেই হয়ত অসীম রায় তাঁর জার্নালে উপরোক্ত মন্তব্যটি করেন। *একালের কথা ও গোপালদেব* ব্যক্তি অসীম রায়ের সাংবাদিক জীবনকেও অনেকখানি পরিচিত করেছে পাঠকের কাছে। *একালের কথা*তে নিত্যগোপালের বড় ভাই তো আছেনই পরবর্তীকালে নিত্যগোপালও সংবাদপত্রে কাজ নেয়। সংবাদপত্রের জগতটি ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত অসীম রায়ের দীর্ঘতম উপন্যাস *আবহমানকাল*-এও রয়েছে। সেখানেও প্রধান চরিত্র টুটুল ও তার দাদা চোঙা সাংবাদিকতার সাথে জড়িত থাকে বিভিন্ন সময়ে। এর পাশাপাশি *গোপালদেব*-এ স্থান পেয়েছে *একালের কথার* সমাজতান্ত্রিক চেতনাসমৃদ্ধ নিত্যগোপালের সমাজচিন্তা ও বিপ্লবচিন্তা, তথা দেশের মানুষের জন্য তার অসীম ভাবনার কথা। দু'শ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার এ উপন্যাসটি পর্যন্ত অসীম রায়ের 'সমাজ সচেতন সাহিত্য' সৃষ্টির মানসিকতা স্পষ্ট। এরপর 'সমাজ সচেতন' বিষয়টি বেশ অস্পষ্ট হয়ে সামাজিক ইতিহাস, মনুষ্য মন ইত্যাদিই তাঁর উপন্যাসের প্রধান আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়।

বন্ধুমাতা নয়নের সাথে সাংবাদিক নিত্যগোপাল চৌধুরীর প্রেম-সম্পর্কের বয়ান ও বিশ্লেষণ হলো *গোপালদেব*-এর বিষয়। নয়ন নিশ্চয়ই অসীম রায়ের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা যা আমরা তাঁর নিজের ডায়েরি জাতীয় রচনা ও *জলার্ক*-এর সংখ্যাগুলোতে ব্যক্তি অসীম রায়কে নিয়ে রচিত তাঁর পরিচিতজনদের লেখায় দেখেছি। তবে মজার ব্যাপার হলো, পরবর্তীকাল রচিত অসীম রায়ের দীর্ঘতম এবং আত্মজৈবনিক উপন্যাস *আবহমানকাল*-এ নয়ন সম্পূর্ণতই অনুপস্থিত। সেকি ঐ 'একঘরে' হয়ে যাওয়ার কারণেই! *আবহমানকাল*-এ টুটুলের অনুভূতি *গোপালদেব*-এর নিত্যগোপালের মত তীব্র নয়। যদিও লেখক টুটুলকে যৌবনে সাহিত্যিক বানিয়ে সাধ্যমতভাবে তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, কিন্তু চেতনাগত নিত্যগোপাল টুটুলের শতগুণ উচ্চে আসীন। *আবহমানকাল* সম্পর্কে অসীম নিজেই বলেছেন 'যার প্রথম চারটে পর্ব পুরোটাই আত্মজীবনী'[১৪] এবং উল্লেখ্য সেখানে নয়ন নেই।

অসীম রায়ের উপন্যাসের একটি প্রধান এবং উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য আত্মজীবনীমূলক উপাদানের ব্যবহার। শুধু উপন্যাসেই নয় তাঁর গল্পগুলোতেও এ বিষয় বড় বেশি স্পষ্ট। এখানে উল্লেখ করা দরকার, আত্মজীবনীমূলক উপাদান ব্যবহারে অসীম রায় যেমন সচেতন তেমনি সেগুলো যাতে শুধুমাত্র সত্য ঘটনার বয়ান না হয়ে সাহিত্য হয়ে ওঠে সে ব্যাপারেও তিনি বিশেষ মনোযোগী। কখনও কখনও লক্ষণীয় যে, তাঁর ব্যক্তি জীবনের একই উপাদান ভিন্ন ভিন্নভাবে তাঁর উপন্যাসে চলে আসে। যদিও অনেক সময় এটাও হয়, যে-উপাদানটি তাঁর জীবনের একটি সময়ের প্রধানতম সেটিই সেই সময়ের আত্মজৈবনিক চরিত্রটি নিয়ে রচিত উপন্যাসটিতে হাজির নয়। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় *গোপালদেব*-এর নয়নের কথা। নয়ন *একালের কথাতে* পুষ্প নামে উপস্থিত যাকে ব্যক্তিজীবনে অসীম রায় 'মাসী' বলে ডাকতেন। অথচ এ মাসী *আবহমানকাল*-এ অনুপস্থিত। তাঁর চারপাশের মানুষ, সময়, স্থান এবং ঘটনা এত বেশি করে তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে যে প্রতিটি রচনা প্রকাশের পরই এ সকল ব্যাপারে বারে বারে তাকে নিন্দা ও তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। 'আত্মজীবনী'র সাহিত্যিক রূপায়ণ হিসেবে তাঁর *আবহমানকাল* বোধ হয় সবচেয়ে বেশি উল্লেখের দাবিদার। *আবহমানকাল* ছাড়াও *দেশদ্রোহী* বা *শব্দের খাঁচায়*ও ব্যক্তি অসীম রায়ের জীবনের অনেক ছড়ানো ছিটানো উপাদান রয়েছে। *শব্দের খাঁচায়* উপন্যাসের নায়ক নির্মলের হৃদয়লক্ষ্মী রাজু অনেক খানিই অসীম রায়ের কৈশোর-যৌবনের পরিচিতা রাজিয়া খান (*চিত্রকাব্য, বটতলার উপন্যাস* প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িতা)[১৫]।

আর একটি ব্যাপার আত্মজৈবনিক উপাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে অসীম রায়ের অনেকগুলো উপন্যাসে। দেখা যায়, তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বা পার্শ্ব চরিত্র সাহিত্য রচনার সাথে জড়িত। *দ্বিতীয় জন্মের* বক্তা-নায়ক কবিতা রচনা করে। *রক্তের হাওয়ার* নায়ক অমর সাহিত্যিক— উপন্যাসের লেখক। *আবহমানকাল*-এর নায়ক টুটুল কবিতা লেখে। শেষে উপন্যাসও লেখা শুরু করে। এছাড়া লক্ষণীয় প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে এসে লেখক সবজান্তার ভুমিকায় দাঁড়িয়ে উপন্যাসের ঘটনাস্রোত, চরিত্রাবলি, তাঁদের বর্তমান অবস্থা ইত্যাদির উপর বক্তব্যধর্মী আলোকপাত করেন যেটা মোটেও প্রীতিকর লাগে না। তবে উল্লেখ্য, তৃতীয় উপন্যাস *দ্বিতীয় জন্ম* এ দোষে দুষ্ট নয়।

*দ্বিতীয় জন্ম*তে অসীম রায় এমন এক বিশ্বকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন যা বেদনায় নীল। মৃত্যুমধ্যে সোনার অবস্থান, পানুদা নিজেই, রমেন-মিনু সম্পর্ক সবকিছু কেমন এক বেদনার্ত অনুভবকে উন্মোচন করে। উপন্যাস শুরুই হলো 'তহবিল তছরুপের অভিযোগে বাবা যখন জেলখানার দরজায় পা দিতে গিয়ে একটুর জন্যে বেঁচে গেলেন তখন লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল' দিয়ে। সেসময় অর্থাৎ স্কুল-কলেজের দিনগুলো দিয়ে শুরু করে *দ্বিতীয় জন্ম* বক্তা-নায়কের আটাশ বছরের বর্তমান পর্যন্ত সময়কে গ্রহণ করেছে। তখনও অবিবাহিত সে। উপন্যাসের শুরুর সময়ে সে বাবাকে অশ্রদ্ধা করত। কিন্তু এখন সে বাবার প্রতি ভীষণভাবে শ্রদ্ধাশীল। নিজের জন্য পাত্রী দেখা প্রসঙ্গে বাবার সাথে আলাপ থেকে বোঝা যায় সে সম্পর্ক বন্ধুত্বে পর্যবসিত। কিন্তু কী সে ঘটনা যা বাবাকে তার এত কাছে নিয়ে এসেছিল? উপন্যাসেও বাবার প্রসঙ্গ অনেকটা সময় অনুপস্থিত। প্রথম পরিচ্ছেদের পর ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে আবার বাবার প্রসঙ্গ এসেছে। এমন উত্তরবিহীন আরও একটি প্রসঙ্গ আছে উপন্যাসে। 'বাবা মনোযোগ দিয়ে ডাক্তারি করেননি' অথচ পরে বেশ দূরদূরান্ত থেকে বাবার কাছে রোগী আসার তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও আছে সমুদ্রকালীন দীর্ঘ ত্রিশ পৃষ্ঠা যা অস্বাভাবিক মনে হয়। বক্তা অর্থাৎ প্রধান চরিত্র ও তার বন্ধু যক্ষারোগগ্রস্ত সোনা ব্যতীত অন্য চরিত্রদের সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন,

> সোনার মা আমাদের সংস্কারগত মাতৃমহিমার এক অদ্ভুত বিকৃত রূপ। মাতৃহৃদয়ের সমস্ত কোমলতা যেন শুষ্ক হইয়া এক কঠোর স্নেহপ্রকাশহীন অভিভাবকত্বে পর্যবসিত হইয়াছে—মা যেন বেতনভোগী শুশ্রূষাকারিণীর প্রতিরূপ হইয়াছেন। এমন কি সোনার বন্ধুর নিকট অর্থ সাহায্য ভিক্ষা করিয়া সে যে পত্র লিখিয়াছে তাহার মধ্যেও একটা রূঢ় অধিকার-প্রয়োগের সুর শোনা যায়। সোনার মৃত্যুর পর তাহার প্রতিহত শোকোচ্ছ্বাস নায়কের প্রতি অহেতুক ক্রোধ ও অভিশাপ-বর্ষণে ফাটিয়া পড়িয়াছে। সোনা নিজে তাহার ভগ্নী মিনু, তাহার মেজদাদা পাদরী ও তাহার আত্মীয় রমেন—সকলেই যেন অস্বাভাবিক, এক ক্ষয়িষ্ণু জীবননীতির বিভিন্নমুখী প্রকাশ। সমস্ত উপন্যাসটিতে যে জীবনচিত্র পরিস্ফুট হয়, তাহা যেন জীর্ণ বিকৃত আবেগ ও কুণ্ঠিত ইচ্ছার টানা-পড়েনে গঠিত, বিবর্ণ রেখা সমষ্টি। অবশ্য সোনা একটা প্রতীক চিত্ররূপে পরিকল্পিত—তাহার প্রতিটি কথায় ও কার্যে একটা ব্যর্থ জীবনাকুতি বে-পরোয়া নৈরাশ্য ও বিতৃষ্ণার ছদ্মবেশে ঝরিয়া পড়িয়াছে।[১৬]

কালানুক্রমিক বিচার করলে স্পষ্ট হয় অসীম রায় তার বিশালাকার আত্মজৈবনিক রচনা *আবহমানকাল* শেষ করার পর আস্তে আস্তে ঐতিহাসিক সময়ের ঔপন্যাসিক সময় নির্মাণের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ওইসব উপন্যাসে তিনি যেমন ঐতিহাসিক চরিত্রকে জীবন্ত করেছেন, তেমনি সেসব সময়কেও বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ পর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর একমাত্র উপন্যাস *নবাববাঁদী*।

নবাববাঁদীর ভূমিকায় অসীম রায় লেখেন,

> কিছুকাল আগে ফার্মিঙ্গারের ফিফথ রিপোর্ট হাতে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দী সম্পর্কে কমবয়সী কৌতূহল বাড়ে আরো কিছু বই সংগ্রহে। ঊনবিংশ শতাব্দী যেনো ঘাঁটা পায়েস। তার চেয়ে অনেক বেশী লেখককে টানে ইংরেজ আগমনের সমসাময়িক কিংবা তার কিছু আগে পরের আলো-আঁধারে মেশা কাল যেখানে লিখিত ইতিহাস আর কিংবদন্তী মাখামাখি হয়ে আছে। আমাদের কালের চেহারা বুঝতেও অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবনযাত্রার অনুধাবন খুব প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে হয়। একেবারে ভিন্ন মেজাজের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া এ সময় নিয়ে ভালো কাজ আর হয়নি।[১৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীকে অবলম্বন করে বাংলাতে বেশ কিছু উপন্যাস আছে এটা সত্যি এবং তুলনামূলকভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী উপন্যাসে গরহাজিরই বলা যায়। ভিন্ন মেজাজের বঙ্কিম এ বিষয়ে যেমনভাবে কাজ করেছেন সে আলোচনায় না গিয়ে ঔপন্যাসিক অসীম রায় *নবাববাঁদী*তে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের পর বাংলার শ্রমজীবী মানুষ, তাদের পরিণতি, অসহায়ত্বকে কিভাবে চিত্রিত করেছেন আমাদের আলোচনা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো।

১৭৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'কাউন্টেস অফ সাদরল্যান্ড' জাহাজে সাত মাসের যাত্রা শেষে কোলকাতার গঙ্গাতীরে এসে নামে তেইশ বছরের যুবক চার্লস ম্যাকিনটশ। 'কাকার মতো এই কোলকাতায় আট দশ বছর বাস করতে পারলেই নবাব' এ ধারণা নিয়েই চার্লসের কোলকাতা আগমন। রাইটার চার্লসের নিকট স্বদেশে টাউনশেন্ড কোম্পানির 'অন্ধকার কালো কঠোর ঝুলভরা অপরিষ্কার বাড়িটা' বিভীষিকার মতো। স্কুলপাঠ্যে ইংল্যান্ডের বৈভব থাকলেও বাস্তবে তার চারপাশের ইংল্যান্ড ক্রমশ খিন্ন, দরিদ্র। 'আর একটু বড় হলেই সে শুনেছে, 'ইংরেজকে বাঁচতে হলে এবং ইংল্যান্ডকে বাঁচাতে হলে ইংরেজকে স্বদেশ ত্যাগ করতে হবে। তাছাড়া ফ্রান্সের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং প্রতিবেশীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিতে ইংল্যান্ড এমন কোণঠাসা যে, তার মতো ঘরকুনো লোককেও ঘর ছাড়তে হয়েছে এবং বিকল্প কোনো পথ নেই'। চার্লস সম্পর্কে লেখকের এ ভাষ্য যেমনভাবে তৎকালীন ইংল্যান্ডকে চিত্রিত করে তেমনি এক আঁচড়ে এঁকে দেয় যুবক চার্লসের মানসিকতাকে। চার্লস প্রকৃতিপ্রেমী। ভারতের সৌন্দর্য তার ভালো লাগে। কিন্তু জাহাজ থেকে নৌকো করে ঘাটে আসতেই 'মাথা কামানো, হাতে পায়ে বেড়ি, কপালে ছেঁকার দাগসহ স্ত্রী-পুরুষ বালক' ক্রীতদাস দেখে সে বেদনার্ত হয়। ঠুনকো মানবতাবাদী এ ইংরেজটি ঠুনকো রেভুলিউশনারিও বটে। পরবর্তী মার্চে উপন্যাস যখন শেষ হয় তখন চার্লস নবাবে পরিণত—অঢেল পয়সার মালিক, গহরের বোনের সঙ্গে সে শুতে অভ্যস্ত, কাকার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী মিস ক্রাফটনের আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে তার বাধে না। এবং তার এসব কিছুর উৎস যেটি তা হচ্ছে স্লেভ ট্রেড।

দেশীয় যেসব চরিত্র এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ধনিক ব্যবসায়ী কৃষ্ণগোপাল দে। কটন পীস গুডস, রেশম ও জাহাজ ব্যবসায়ী কৃষ্ণগোপাল উপন্যাসের শেষে গিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে জমিদারে পরিণত। বাণিজ্যে কোনো আধিপত্য দেশের লোকের হাতে রাখা চলবে না এ নীতি নিয়েই ইংরেজরা রুদ্ধ করে দেশীয় মহাজনদের সব ব্যবসা-বাণিজ্য যার শিকার শহরের অন্যতম ব্যবসায়ী কৃষ্ণগোপাল দে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির পরাজয়ের পর ইংরেজ ভারত শাসন করেছে একশ' নব্বই বছর। ভারতের স্বাধীনতার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত। অথচ তখনকার মতো এখনো পুরো সময় জুড়েই নীতি-আদর্শ-মানবিকতা নয়, প্রাধান্য পেয়েছে বাণিজ্য। বাণিজ্য হয়েছে আইনের উৎস, রাজনীতির নীতি, শাসকের শঠতার কারণ। সে-বাণিজ্যের কারণেই ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ। চারপাশের হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মরে থাকলেও সে বাণিজ্য থামেনি। অমৃতর মা মুড়িওয়ালী না খেতে পেয়ে তার ৮ বছরের ছেলেকে দেড় টাকায় বিক্রি করলেও সে বাণিজ্য থামেনি। যেহেতু 'স্লেভ ট্রেড ব্রিংস মানি' সুতরাং ওই ট্রেডই সই। আর সে-বাণিজ্যে সহায়ক হয় সকালে পূজা পাঠ করে আসা কপালে দইয়ের ফোঁটা দেয়া বানিয়ান গোকুল মুখার্জী। সে-বাণিজ্যে চামচাগিরি করে

রামগতি মিত্র গুরুর দোহাই দিয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। সে-বাণিজ্যেরই সাহায্যকারী বালখাজার—ছ' মাইল হেঁটে পানিতে চেপে সে চুঁচড়োয় যায় প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে। *নবাববাঁদীর* ভূমিকায় অসীম রায় বলেন: 'আমাদের এ কালের চোখ দিয়ে অতীতের পুনর্বিন্যাস কি সম্ভব নয়?' *নবাববাঁদীর* ঘটনার দু'শ বছর পরও বাঙালির অবস্থার অপরিবর্তনীয়তা দেখে মনে হয় অসীম রায় *নবাববাঁদীতে* অতীতের পুনর্বিন্যাসই শুধু চাননি হয়তো সে সঙ্গে অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্তমানকেও বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন। তবে "পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ার অনিবার্যভাবে আছে খণ্ডন। পুরনো গঠনের খণ্ডন, তবেই প্রকৃত পুনর্বিন্যাস। *নবাববাঁদী* উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই এই ভাঙন ও বিন্যাসের প্রক্রিয়া চলে পাশাপাশি"[১৮]। বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলেন তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কিন্তু তাঁকে কোন বিশেষ রাজনৈতিক অভিধায় চিহ্নিত করা চলে না।

তাঁর উপন্যাসে ভারত-বিভাগ, বিভাগকালীন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ইত্যাদি প্রতীয়মান হলেও গল্পগুলোর রাজনৈতিক অনুষঙ্গ পশ্চিমবাংলায় নির্বাচনের মাধ্যমে বাম যুক্তফ্রন্টের বিজয়, নির্বাচনে অবিশ্বাসী নকশাল আন্দোলনের উদ্ভব, ক্ষমতাসীন বাম সরকার-নকশাল সংঘর্ষ এবং তা নিয়ে রাজনীতি-সম্পৃক্ত কথা ও সাধারণ মানুষের ভাবনা। গল্পের প্রেক্ষাপট, চরিত্রায়ণ বা কথোপকথনে অসীম রায় এসব বিষয়কে এনে তাকে রূপ দেন একটি প্রশ্নে—এবং তার কৃতিত্ব এখানেই যে বোদ্ধা পাঠক সহজেই বুঝে ফেলেন প্রশ্নটি প্রকৃতপক্ষে চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজের, সমাজের সকল মানুষের। সারাজীবনে রচিত মোট চৌষট্টিটি গল্পের মধ্যে সম্পূর্ণত রাজনৈতিক গল্পের সংখ্যা চৌদ্দ। যেমনভাবে তার সব উপন্যাসেই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত রাজনৈতিক চেতনা ও উপলব্ধি লুকিয়ে থাকে, ব্যাপারটি একইভাবে সত্য তাঁর প্রায় সকল গল্পের মধ্যেও। কিন্তু তারপরও রাজনৈতিক চৌদ্দটি বাদে তাঁর আরও নয়টি গল্প রয়েছে যেখানে রাজনৈতিক পরিবেশ, চরিত্রের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, অথবা পর্যুদস্ত রাজনীতির অভিঘাত যথেষ্ট স্পষ্ট, মূর্ত। তবে স্বীকার করতেই হয় অসীম রায়ের প্রায় সকল গল্পেই একটি আঁচড়ে হলেও রয়েছে রাজনৈতিক আভাস, ইঙ্গিত, পরিমণ্ডল।

অসীম রায়ের গল্পের ঘটনাস্থানটি সবসময়ই পশ্চিমবঙ্গ। গুটিকয়েক গল্পের প্রেক্ষাপট সাঁওতাল পরগনা, বা গোয়াতেও স্থাপিত। পশ্চিমবাংলা অর্থাৎ যে সমাজের মধ্যে তাঁর গল্প স্থাপিত সে-পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসটি সবার জানা তবুও একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখা দরকার। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবাংলা তথা ভারতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন চলছিল। সে-আন্দোলনে শরিক ছিলেন অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী। ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বে যেমন স্বাধীনতার পরেও তেমনি সে প্রক্রিয়াটি প্রবহমান। ১৯৬৭ সালে এ আন্দোলনে আসে অভূতপূর্ব বিজয়। প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারিয়ে সিপিএম জয়ী হয়। দীর্ঘ সময়ের স্বপ্ন বাস্তবের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়। ইতোমধ্যে শুরু হয় চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশাল আন্দোলন। নকশালীরা মনে করতেন, নির্বাচনের ভেতর দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া সমাজতন্ত্রের নামে মিথ্যাচার মাত্র—কেননা, সে সরকার সত্যিকার অর্থে জনগণের কল্যাণার্থে নিয়োজিত হতে পারবে না। শুরু হয় ত্রিমুখী লড়াই—কংগ্রেস, সিপিএম বামফ্রন্ট ও নকশালের মধ্যে। দৈনন্দিন জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিসহ। অস্ত্রবাজী ও মৃত্যু হয়ে দাঁড়ায় প্রাত্যহিক ব্যাপারের মত। নকশাল নেতা চারু মজুমদার ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ধরা পড়ে

মারা গেলে একসময় স্তিমিত হয়ে যায় নকশাল আন্দোলন। এসে পড়ে নির্বাচন। পরাজিত হয় বামফ্রন্ট। ১৯৭৭ সালে যখন পুনরায় প্রাদেশিক নির্বাচন হয় তখন বামফ্রন্টের ঘটে পুনরুত্থান। অসীম রায়ের মৃত্যু অবধি পশ্চিমবাংলার শাসন ক্ষমতায় আসীন থাকে বামফ্রন্ট।

"বাস্তবকে যখন আর কোনো পরোক্ষতায় ধরা যায় না, তখন, বাধ্যতই উপন্যাস লিখতে হয়।"[১৯] —দেবেশ রায়ের এ ভাবনা স্বতঃসিদ্ধ বলেই হয়তো অসীম রায়ও এক সময় নিজেকে কবিতা থেকে গুটিয়ে নিয়ে আসেন প্রধানত উপন্যাসে। এ বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি হচ্ছে "কলকাতার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আমাকে কবিতা থেকে গদ্যে টেনে নিয়ে এসেছে।"[২০] যদিও সমসাময়িক কালকে কাগজের পাতায় স্থাপিত করার জন্য পরবর্তীকালে তিনি নিজে উপন্যাসের চেয়ে গল্পকেই ফর্ম হিসেবে বেশি পছন্দ করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়,

> ১৯৬৭ সালে যেবার কংগ্রেস সাধারণ নির্বাচনে হারলে বামপন্থীদের কাছে সে রাতটা কাগজের রিপোর্টার হয়ে কলকাতার পাঁচমাথার মোড়ে বেশ খানিকক্ষণ কাটিয়েছি। চারপাশে প্রকাণ্ড উত্তেজনা কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা প্রকাণ্ড প্রত্যাশা। তার সঙ্গে মিশে গেল আমার কৈশোরান্তে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। ...
>
> ভোরবেলা বাড়ী ফিরে বুঁদ হয়ে বসে থাকলাম। ঘটনার ওপরে নয়, তিনটে চরিত্রের ওপর আমার প্রথম গল্প 'আরম্ভের রাত'।[২১]

অসীম রায় প্রথম যৌবনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের মিছিলে নিজেও শরিক ছিলেন। '৬৭তে বামফ্রন্টের জয়ে অনেকের সাথে তিনিও উল্লসিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে উল্লাসে ভাটাও আসে। শাসনকালীন বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন আচরণ ও কর্মকাণ্ড তাঁর মধ্যেও বিস্তার ঘটায় শতেক প্রশ্নের। পরে যখন ১৯৭৭ সালে আবার সেই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় গেল তখন ডায়রিতে তিনি লেখেন, "এবারে বামপন্থী ফ্রন্ট সুস্থ একটা সরকার চালাক পশ্চিমবাংলায় এটা আমি মনে প্রাণে চাই। আমি লেখক, কাজেই পঁয়তাল্লিশ বছর আগে রানাঘাটে আমার শৈশব আমার কাছে যেমন দামী, তেমনি দামী আমার চারপাশের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ।"[২২] দশ বছর আগে 'আরম্ভের রাত' লিখবার সময় যে প্রত্যাশার দোলায় তিনি দুলেছিলেন সে দোলায় সাধারণ মানুষ দুললেও তখন তিনি আর দুলছেন না। মোট চৌষট্টিটি গল্পের তেইশটি তো এসব ভাঙাগড়া, চিন্তা-চেতনার উচ্ছ্বাস, আলোড়ন, হতাশা-প্রত্যাশা নিয়েই রচিত। বাকি অনেকগুলোতে যেন হালকা আঁচড়ে মাঝে মাঝেই মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর চারপাশ—যে চারপাশ রাজনৈতিক, রাজনৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আশা হতাশায় আবৃত। অন্য আর যেসব গল্প রাজনৈতিক সময় ও প্রেক্ষাপটকে নিপুণভাবে ধরতে পেরেছে সেগুলো হলো 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র,' 'প্রেমের হাল কে বোঝে শালা', 'শ্রেণীশত্রু', 'অনি', 'ঘরে ফেরা', 'ডহরে ডুবিল ডিঙ্গা', 'ভারতবর্ষ', 'পূর্ণচন্দ্র', 'চংক্রমণ'। সময়ক্রম হিসেব করলে স্পষ্ট হয়, অসীম রায়ের প্রথম দিককার সব গল্পই পূর্ণত রাজনৈতিক। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক গল্পের সাথে অরাজনৈতিক গল্পের মিশ্রণ শুরু হয়। রাজনৈতিক গল্পের মধ্যে 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র', 'অনি', 'অবনিভূষণ-চাটুজ্জে-সুষমা' ইত্যাদি বাংলাভাষী পাঠক দীর্ঘদিন মনে রাখবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও অসীম রায়ের 'করিমের জাগরণ' নামের একটি গল্প রয়েছে।

অসীম রায় তাঁর সময়ের নির্মাতা। নির্দিষ্ট সময়-প্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানুষের নির্মাতাও তিনি। সে-নির্মাণে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গগুলো অঙ্গীভূত হচ্ছে কিনা তা তাঁর বিচার্য ছিল না কখনই। তাইতো তিনি ডায়েরিতে লেখেন, যার অংশবিশেষ আমরা আগে একবার উদ্ধার করেছি তা হলো,

> আমি লেখক, কাজেই পঁয়তাল্লিশ বছর আগে রানাঘাটে আমার শৈশব আমার কাছে যেমন দামী, তেমনি দামী আমার চারপাশের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ। এটাই আমার কাছে লেখকের মনোবৃত্তি। লেখককে তার আত্মজিজ্ঞাসা ও সমাজ জিজ্ঞাসাকে ক্রমাগত এক করবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নইলে সে লেখক কেন?[২৩]

সেই লেখক হতে গিয়েই ফর্ম হিসেবে বেছে নিলেন উপন্যাসকে। 'আত্মজিজ্ঞাসা' ও 'সমাজজিজ্ঞাসা' বারবার তাঁর উপন্যাসকে ব্যক্তিগত অনুভূতি-অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত করতে থাকল। প্রথাসিদ্ধভাবে গল্পের কাঠামোতে উপন্যাস রচনা তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। মৃত্যুর আগে তাই উপন্যাস সম্পর্কে লিখলেন,

> উপন্যাস মানে, অন্তত এই লেখকের কাছে, জমাট গল্প নয়। গল্প থাকতে পারে এবং থাকাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই প্রধান নয়। উপন্যাস মানে একটা চৈতন্যের আলোড়ন, বা আরো সাদামাটা ভাষায় ভাবের আলোড়ন, ইংরেজি ক্রিয়েটিভ ভিশান কথাটাও মন্দ নয়।[২৪]

এ উপলব্ধি কিন্তু অসীম রায়ের সাহিত্যিক জীবনের শুরুতেই হয়েছিল। আর সেজন্যই প্রথম উপন্যাস *একালের কথার* শুরুতে ফরাসী সাহিত্যিক স্তাঁদাল থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরেন "আরে মশাই, একটা উপন্যাস হল গিয়ে একখানা আয়না যার রাস্তা দিয়ে চলেছে কেউ।" কিন্তু চারপাশের মধ্যবিত্ত সীমাবদ্ধতা তাঁকে সে পথে চলতে দিচ্ছিল না। আর সে কারণেই হয়তোবা গল্পে ফিরে যাওয়া বা ফিরে যাওয়া ঐতিহাসিক সময়ে যেখানে লেখকের ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ তো অন্তত অনুপস্থিত!

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে কলকাতার শহরকেন্দ্রিক জীবনযাপন ও মধ্যবিত্ত মন নিয়ে যাঁরা বাংলা উপন্যাস লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-১৯৭৫) সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), বিমল কর (জ. ১৯২১), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) প্রমুখ অন্যতম। সে তালিকায় অসীম রায় একটি অনস্বীকার্য নাম। পরবর্তীকালে তাতে আরো যাঁরা যুক্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (জ.১৯৩৪) এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯৩৫) বিশেষ উল্লেখের দাবিদার। কিন্তু ভাবতে বিস্ময় লাগে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে অনুভূতিপ্রবণ, ক্ষুরধার, নিরাসক্ত ও নির্ভীক যিনি সেই অসীম রায় আজ বিস্মৃতপ্রায়। পাঠকের প্রিয় তিনি হননি, যদিও সমালোচক তাঁকে উপেক্ষা করেননি। তাই অসীম রায়ের উপন্যাসগুলো নিয়ে বাংলা উপন্যাসের বিদগ্ধ সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ কিন্তু অবশ্য-পাঠ্য একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বর্তমান আলোচনা শেষ করতে চাই—

> অসীম রায়কে উপেক্ষা করা হয়েছে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিষয়গত দেউলিয়া যুগে। বিমল মিত্র বা অবধূত যখন ক্রেতাদখলের শিল্পজ্ঞানহীন অথচ চমকদার আয়োজনে পসরা সাজিয়েছেন, অসীম রায় সেই সময়ে 'একালের কথা' 'গোপালদেব' থেকে শুরু করে 'শব্দের খাঁচায়,' 'দেশদ্রোহী', 'একদিন ট্রেনে' [একদা ট্রেনে], 'আবহমানকাল' প্রমুখ উপন্যাসে সময়সমাজের পটে ধৃত চলিষ্ণু ব্যক্তিপাত্রের বৌদ্ধিক সংকট, অস্তিত্বের যন্ত্রণা এবং জীবনকে সমগ্রে বুঝে নেবার তাগিদের অন্তর্গূঢ় কবিতা,

গদ্যনাটক সৃষ্টি করে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিস্ময়কর ছিল তাঁর গদ্যশৈলী। বলা যেতে পারে তাঁর হীরকোজ্জ্বল গদ্য, যা তিনি গড়ে নিয়েছিলেন জীবনের অন্তর্গূঢ় কবিতা, চিন্তা-স্রোতের উপল-সংঘাত-বিচিত্র গতিকে অনুধাবন করতে করতে সে গদ্য ছিল এক হিসাবে তাঁর তীক্ষ্ণ নৈতিক অবধানতার দান—ব্যক্তিপাত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের অভিজ্ঞান। বিমল কর ছাড়া সমকালীন আর কোন বাঙালি উপন্যাস লেখক এমন গদ্য গড়ে তোলেননি, যা একই সঙ্গে বিজ্ঞাপক, প্রভাবক, গূঢ় ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ এবং গতি তৎপর। এই দুই লেখকের যে কোনো একটি বাক্যের শব্দযোজনাও ছিল উপন্যাসের সমগ্র বাতাবরণের দান। এইভাবে অসীম রায় একালের নায়ক কল্পনায় এবং তার প্রমূর্তায়নে অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে গেলেন। তাঁর 'আবহমান কাল' [আবহমানকাল] বড়ো মাপের উপন্যাস। হয়তো তাঁর আত্মবীক্ষণও বটে। কিন্তু মননের দিক থেকে ঋজু এবং গভীরধর্মী এই লেখক জানতেন আত্মবীক্ষণ—যদি একালের মানুষের আত্মবীক্ষণ হয় তাহলে অবশ্যই তা বিশ্ববীক্ষণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছোটো মাপের, হয়তো বা তাঁর গৌণ রচনাই বলব 'নবাববাঁদী' এই বীক্ষণস্বাতন্ত্র্যে, ইতিহাস চেতনায় অনেক হাতে গরম সাহেব বিবি গোলামের কেচ্ছাকলমুখর সেই সময় অপেক্ষা সময়ের দিক থেকে পিছু হটেও ভাবনার দিক থেকে অগ্রবর্তী রচনা।[২৫]

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. দ্রষ্টব্য : কানাডার মন্ট্রিয়ল থেকে ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৩-এ *জলার্ক* পত্রিকার সম্পাদককে লেখা অসীম রায়ের দিদি ছবি বসুর চিঠি। এতে তিনি *ফুটপাথে ফুলের গল্প*-এরও আগে *নবমল্লিকার* কথা উল্লেখ করেন। চিঠিটি *জলার্ক* (সম্পা. মানব চক্রবর্তী, কলকাতা)-এর একবিংশ সংকলনের (মাঘ ১৩৯৯-পৌষ ১৪০০) সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'য় ছাপা হয়েছে।

২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* কলকাতা, নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ৮০০-৮০১

৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* কলকাতা, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, দ্রষ্টব্য : 'নির্ঘন্ট ক', পৃ. ৪১৯

৪. শাহীদা আখতার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, দ্রষ্টব্য : 'নির্ঘন্ট', পৃ. ২২৫

৫. বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা কথাসাহিত্যের একাল,* কলকাতা, ১৯৯৮, দ্রষ্টব্য : 'নির্দেশিকা', পৃ. ৪১৬

৬. সত্য গুহ, *একালের গদ্য পদ্য আন্দোলনের দলিল,* কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯, দ্রষ্টব্য : 'নির্দেশিকা-' পৃ. ০১

৭. দ্রষ্টব্য : 'অসীম রায়ের ডায়েরী দ্বিতীয় পর্ব', জলার্ক, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৭। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮-এ লেখক লিখছেন,

১৯৫৩ সালে প্রকাশিত একালের কথা থেকে ১৯৭৩-এ প্রকাশিত অসংলগ্ন কাব্য পর্যন্ত কুড়ি বছরে বই বিক্রি বাবদ লেখকের রয়ালটি :

একালের কথা	৫০০
গোপালদেব	(-) ৫০০
দ্বিতীয় জন্ম	০০

রক্তের হাওয়া	২৫০
দেশদ্রোহী	২৫০
শব্দের খাঁচায়	৭০০
অসীম রায়ের গল্প	৩০০
মোট পেয়েছি	২,৩০০ টাকা

এই অঙ্কটা এখন ঠিক আমার *স্টেটসম্যান* অফিসের মাসিক মাইনে। অবশ্য বাড়িতে আনি কয়েকশো টাকা বাদ। তার মানে কুড়ি বছরব্যাপী সাহিত্যিক পরিশ্রম = এক মাসে *স্টেটসম্যানে* সাংবাদিক পরিশ্রম। গোপালদেব-৫০০ অর্থাৎ নিজে এবং বন্ধু হীরেন মিত্রের যৌথ ব্যয়ে ১৬০০ টাকা খরচায় ছাপা— বিক্রি বাবদ ১১০০ টাকা ওঠে, বাকি বই এদিক ওদিক দপ্তরী বাড়িতে, বোধ হয় সের দরে বিক্রি হয়।

৮. যদিও অসীম রায় মনে করতেন-

আমার এখন ধারণা জন্মেছে আমার বই একটার পর একটা মার খেয়ে যাবে যেমন আগেও খেয়েছে। এবং এটা আমার বিশ্বাস (বোধ হয় ভ্যানিটি নয়), আমি যখন থাকব না তখন আমার বই লোকে পড়বে।

('অসীম রায়ের ডায়েরী', *জলার্ক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০)

৯. পূর্বোল্লিখিত *জলার্ক* পত্রিকার দ্বাবিংশ সংকলনের (*মাঘ ১৪০১- পৌষ ১৪০২*) 'অসীম রায় : প্রাসঙ্গিক তথ্য'তে ১৯৭৫ সালের বিপরীতে *গৃহযুদ্ধ* -এর নাম উল্লেখ পেলেও প্রকৃত তথ্য হলো উপন্যাসটি পত্রিকাটির মে '৭২ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। বর্তমান আলোচকের সে-সংখ্যাটি দেখার সুযোগ হয়েছে।

১০. পূর্বোল্লিখিত *জলার্ক* পত্রিকার দ্বাবিংশ সংকলনে 'অসীম রায়, যেটুকু দেখেছি' নিবন্ধে কিন্নর রায় ভিন্নরকম যে তথ্য দেন তা হলো,

"অসীম রায় সে বছর শারদীয় 'পরিচয়' ও শারদীয় 'বসুমতী'তে লর্ড ক্লাইভ, তখনকার সুবে বাংলা, ক্লাইভের আগে নবাবী আমল—সব নিয়ে উপন্যাস লেখেন। পরে এই দুটি অংশ একই মলাটে বাঁধাই হয়ে বেরোয়। নাম হয়েছিল 'নবাব-বাঁদী'। শারদীয় সংখ্যায় এ লেখার একটি অংশের নাম ছিল 'দুই নবাব'।"

বর্তমান আলোচকের শুধুমাত্র *নবাববাঁদী*'র (মনীষা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৮) গ্রন্থরূপ দেখার সুযোগ হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় অসীম রায় নিজে *পলাশী কতদূর* উপন্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তাহলে কি এ পর্যায়ে অসীম রায়ের উপন্যাস মোট দুটি—*পলাশী কতদূর* এবং *নবাববাঁদী*? উপর্যুক্ত ভূমিকাতে কিন্তু *নবাববাঁদী* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য অসীম রায় *বারোমাস* পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। *জলার্ক*-এর দ্বাবিংশ সংকলনে 'অসীম রায় : প্রাসঙ্গিক তথ্য' অংশে ১৯৮০-এর বিপরীতে *নবাব ক্লাইভ* ও *নবাব আলিবর্দীর* নাম উল্লিখিত হয়েছে।

১১. *জলার্ক* দ্বাবিংশ সংকলনের 'অসীম রায় : প্রাসঙ্গিক তথ্য' অংশে তারিখটি ১৫ মার্চ উল্লিখিত হলেও দে'জ পাবলিশিং কলকাতা থেকে ১৯৯৪-এ প্রকাশিত *গল্প সমগ্র*-১-এর 'কথামুখ' অংশে অসীম রায়ের পুত্র উজ্জ্বল রায় তারিখটি ৯ মার্চ বলে জানিয়েছেন। উজ্জ্বল রায় উল্লিখিত তারিখটিকে আমরা বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করছি।

১২. শাহীদা আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

১৩. *জলার্ক,* একবিংশ সংকলন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

১৫. এ প্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম রচিত 'অসীম রায়ের রাজু' নিবন্ধটি (*জলার্ক,* বিংশ সংকলন) দেখা যেতে পারে।

১৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০০

১৭. *নবাববাঁদী,* পূর্বোক্ত, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১৮. পরিমল ভট্টাচার্য, 'নবাববাঁদী : খন্ডন ও বিন্যাস', *জলার্ক,* একবিংশ সংকলন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

১৯. দেবেশ রায়, 'উপন্যাসে স্বদেশজিজ্ঞাসা : 'ধুলোমাটি', *উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে,* কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৯০

২০. *জলার্ক,* একবিংশ সংকলন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

২১. *গল্প সমগ্র*-১, পূর্বোক্ত, এর ভূমিকায় উজ্জ্বল রায় উদ্ধার করেছেন।

২২. *জলার্ক,* একবিংশ সংকলন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

২৩. *জলার্ক,* একবিংশ সংকলন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

২৪. অসীম রায়, 'লেখকের জবানবন্দী', *অসীম রায়ের ছোটগল্প,* কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯২, পৃ. ০৫

২৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ৮৭-৮৮